তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সমধর্মী রচনার সঙ্গে কালকূটের রচনার তুলনা

উনিশ'শ ছেচল্লিশ (১৯৪৬) থেকে উনিশ'শ অষ্টআশি এই দীর্ঘ চার দশক সময়কালের মধ্যে সমরেশ বসু প্রায় শতাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এছাড়াও লিখেছেন গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের রহস্যকাহিনি এবং ছোটোদের জন্য গোগোল সিরিজ। সমরেশের ছদ্মনামগুলির মধ্যে 'কালকূট' নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনি সিনেমা পত্রিকাগুলির জন্য 'ভ্রমর' ছদ্মনামেও কিছু উপন্যাস লিখেছিলেন। তবে 'কালকূট' নামে রচিত উপন্যাসগুলি তাঁর স্বগুণে বাংলা উপন্যাসের পাতায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সাধারণ পাঠক সমাজ, কালকূট রচিত উপন্যাসগুলিকে অধিক আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতে লেখক, শ্রেণি নির্বিশেষে মানুষের অন্তর জগতের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতিগুলিকে সমমর্মী ভাবানুভূতির সাহায্যে তুলে ধরেছেন। কালকূট তাঁর রচনায় বহুবার একটি কথা বলতে চেয়েছেন—

> ''... আমি যাই সুধার সন্ধানে। তীব্র বিষ নাম আমার কালকূট। গরল আমার ধমণীতে। সেই কবিতার মতো বলতে ইচ্ছা করে, 'চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন/ব্যথীর বেদন বুঝিতে পারে? কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে/কভু আশীবিশে দংশেনি যারে?' আমার দৌড়ঝাঁপ ছুটোছুটি যাই বলো, সেই কারণে। মরি যে! জ্বলি যে! তাই আমি ভ্রমি সুধার সন্ধানে। বাঁচতে কে না চায়? মানুষ তো বহুত দূর, ওটা জীবের ধর্ম। হতে পারি কালকূট। তা বলে অমৃতের সন্ধানে যাব না? এই আকণ্ঠ বিষ নিয়ে বাঁচবো কেমন করে?''[১]

'কালকূট' নামাঙ্কিত উপন্যাসগুলি সবই প্রায় ভ্রমণমূলক। তবে শুধুমাত্র ভ্রমনোপন্যাস বললে এদের সমগ্র পরিচয়টা দেওয়া হয় না। এগুলি কেউই গতানুগতিক ভ্রমণ ভিত্তিক রচনা মাত্র নয়। এই সমস্ত উপন্যাসগুলিতে লেখক মানুষ ও প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টিপাত

করেছেন। বিচিত্র মানব প্রকৃতির রসময় সৌন্দর্য, তার গভীর বেদনার আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সমরেশ বসুর 'কালকূট' ছদ্মনামে লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রমণের কথা পাই, কিন্তু সে ভ্রমণ কেবল পথ আর পরিপার্শ্বের প্রকৃতি চিত্র নয়; তাতে আছে মানুষের মনোগহনের রূপ। বাংলা সাহিত্যের ধারায় এই বিষয়গত লেখক হিসাবে কালকূট উত্তরাধিকারী স্বরূপ একা নন। অনেক লেখকের রচনাশৈলীর মধ্যে এই বিষয়ের পরিস্ফুটন লক্ষ করা যায়। এমনকি, ভ্রমণ কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে ছদ্মনামেরও বহু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা ভ্রমণ কাহিনির লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যেও ছদ্মনামের বিষয়টি বেশ প্রকট রয়েছে। যেমন জ্যোতির্ময় ঘোষ ও কমলকুমার গুহ মিলে শঙ্কু মহারাজ নামে ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন। অন্যদিকে চুঁচুড়ার দুলাল মুখোপাধ্যায় সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হয়ে যিনি ফাঁসি কাঠ থেকে নিজেকে অজ্ঞাতবাসে সরিয়ে নিয়ে জনৈক তান্ত্রিক অবধূত সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে স্বামী কালিকানন্দ অবধূত নাম ধারণ করেন, সেই তিনি 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর লেখক অবধূত হয়ে যান। আবার ভবানী সেনগুপ্ত চানক্য সেন ছদ্মনামে লেখেন 'ধীরে বহে নীল'—যা সাড়া জাগানো ভ্রমণ কাহিনি। স্বনামেও লিখেছেন অনেক স্বনামধন্য লেখক। যেমন- সৈয়দ মুজতবা আলী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার চক্রবর্তী। শেষোক্ত তিন লেখক শুধুমাত্র ভ্রমণ কাহিনি লেখক হিসেবেই সুপরিচিত হন। তবে কালকূটের রচনাগুলির মধ্যে এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে কালকূটের নিজস্ব পছন্দের ভ্রমণ কাহিনিগুলির মধ্যে অন্যতম—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে', রাণীচন্দ-র 'পূর্ণকুম্ভ'। এছাড়াও রয়েছে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিমালয় ভ্রমণ' বিষয়ক লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপান যাত্রীর ডায়রি'-র মতো ভ্রমণ উপাদান সমৃদ্ধ বইগুলি। অথচ সমরেশ কালকূটের লিখন রীতির মধ্যে এই সব ভ্রমণ কাহিনিকে একেবারেই অনুকরণ করেন নি। সমরেশ নামে লেখাগুলিতেও কালকূটের ছাপ নেই। স্বনামে লেখার পাশাপাশি লেখক বছরে একটা করে ভ্রমণ কাহিনি লিখতেন। আর সেইটা লিখতেন ছদ্মনামে। এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির মধ্যে লেখকের এক অন্য ধরণের উপলব্ধি ও মানসিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সচেতন বাস্তব

থেকে কালকূট যেন প্রকৃতির অলৌকিক টানে ভেসে যান এক অচিন সুদূরে। দিন যাপনের নিত্য টানাপোড়েনের বাইরে লেখক নিজের মধ্যেই ক্রমশ আবিষ্কার করেছিলেন আরেক সত্তা, আর একটি মানুষকে। যে মানুষটার চোখ দেখে আর একরকম ভাবে, কান শোনে আর একরকম ভাবে, মন উদাস হয় কোন অলক্ষ্য ভাবজগতের ডাকে। অধরা প্রকৃতির হাতছানি এই মানুষকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। মনোজগতের সেই উপলব্ধিকেই তিনি অন্য আর এক ধরণের লেখায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে সেই ভাবনার মানুষটাকে লেখার মধ্যে দিয়ে গড়ে নিয়েছিলেন এক নতুন আদর্শে আর কাল্পনিক অবয়বে। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কালকূট। সাহিত্য ও সৃষ্টির জগতে একই মানুষের দুই নামে লেখার জাত-গোত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ছদ্মনামে লেখার ভাষা-চরিত্র বর্ণনা সবই স্বনামে লেখা রচনার থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। এই রচনাগুলির মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে লেখকের শৈশব, কৈশোর, নিবিড় নির্জন প্রকৃতি। কখনও পার্বত্য শহর কিংবা অরণ্য, কখনও আটপৌরে গ্রামগঞ্জ কিংবা দিগন্ত প্রসারী সমুদ্রের বেলাভূমি। ক্রমশ এই সমস্ত লেখারও ধরণ আর গতিপ্রকৃতি দিক বদল করছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর নিজের ঘুরে ঘুরে দেখা শারীরিক আর বাস্তব ভ্রমণ কাহিনি একটু একটু করে বাঁক নিয়েছিল কল্পনার ভ্রমণে। কখনও ইতিহাসে বা পুরাণের মধ্যে। কখনও তা অতীন্দ্রিয় জগতে। এইভাবে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অপর একটি শাখা ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছিল ছদ্মনামের আড়ালে থাকা কোনও শক্তিমান লেখকের হাতে। দ্বিমুখী প্রতিভার স্ফূরণে একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় হয় তাঁর ছদ্মনামের রচনাগুলিও।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'—নামক উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে লেখক নিজেই তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

> ''যথার্থ ভ্রমণ কাহিনী কাকে বলে, তা নিয়েও বিস্তর বিতর্ক। ভ্রমণকে কাহিনীর সংজ্ঞা দেওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে সকলে একমত নন। লেখকের ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী, তার ওপরেই বোধ হয় নির্ভর করে, কে কেমন লিখবেন। সত্যনিষ্ঠ তথ্যনিষ্ঠ অবিশ্যিই হতে হবে, ভ্রমণ স্থানের ভূগোল আর ইতিহাসের বিষয়ে। কিন্তু পথের মানুষকে বাদ দিয়ে কি, কেবল স্থান মাহাত্ম্য রচনা হবে? ... যে প্রাচীন মন্দিরের আদি ইতিহাস জেনেছি, তার বিগ্রহের পূজারী যখন প্রবাসী মানুষটির

সঙ্গে দু-চারটি সুখ-দুঃখের কথা বলে, তখন তা কাহিনীরই মাত্রা পেয়ে যায়। ... ওড়িশার সিমলিপালের জঙ্গলের গভীরে, বাংলোর আরাম কেদারায় বসে বড়াই পানীর ঝর্ণা দেখতে ভালো লাগে। রৌদ্র কিরণে তার নানা রঙের খেলা, শ্রবণে নিরন্তর গীত, আমার কাছে সেখানেই সে পূর্ণ না। নিচে নেমে যেখানে সে সর্পিল গতিতে চলেছে বেগে, তার ধারে উপল খণ্ডে একট মৎস্য সন্ধানী মানুষ, সারা দিনের কাজের শেষে বনবালা গা ভিজিয়ে শীতল হয়, বড়াই পানীর ঝর্ণা যেন তখনই প্রাণ পায় আমার কাছে। কারণ, মনে তখন কল্পনা আর জিজ্ঞাসা জাগে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই তো বিকাশ। কল্পনা আর জিজ্ঞাসাই কি সৃষ্টির উৎস না?"[২]

লেখকের ভ্রমণ রচনার কাহিনিগুলি কেবলমাত্র ভ্রমণ পথের মানচিত্র রচনা করে নি। যে কোন পরিস্থিতিতেই মানুষ ও তার জীবন তাঁর কাছে গভীর তাৎপর্যে ধরা দেয়। কালকূটের তত্ত্ব তল্লাস সমস্তটা হলো মানুষকে ঘিরে। মানুষই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তার সঙ্গে অবশ্যই প্রকৃতির রূপ, প্রকৃতির বিস্ময়কর খেয়াল, ভৌগোলিক পরিবর্তন, ইতিহাসের ভাঙাগড়ার বিচিত্র ঘটনাবলীকেও তিনি তাঁর কাহিনির মধ্যে আশ্রয় করেছেন। তাঁর ব্যক্তি পরিচয়ের সূত্রে বন্ধু অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ্য—

"এক সমরেশ সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, আরেকজন হল বাউল। সামাজিক সমরেশ যে কত লোকের দায়িত্ব নিত বলে শেষ করা যাবে না।... এটা কালকূট করে নি। সে মাঝে মাঝেই পালাতে চাইত..। সব ফেলে, সব ছেড়ে।"[৩]

এই ঘর ফেলে বাইরের হাতছানিতে পথে বের হবার তাগিদ কালকূট রচনা সমগ্র-র মধ্যে প্রবহমান। সেখানে কালকূটের নিজস্ব ভঙ্গিতে চলন, বলন, রীতি, বিবরণ প্রধান হয়ে ওঠে। বলা যায় তাঁর লেখার আঙ্গিক ও বিষয়গত বৈচিত্র্যের কারণেই তিনি প্রথাগত ভ্রমণোপন্যাস লেখকদের থেকে আলাদাভাবে পরিগণিত হন। কালকূটের লিখন প্রবণতার বিশিষ্টতা সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে এগুলি কোনওটাই প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র ভ্রমণোপন্যাস নয়। তাঁর বৃত্তান্তে কখনও ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণী থাকে না। অন্যদিকে

তাঁর রচনাগুলি কেবলমাত্র গল্পে গ্রথিত ভ্রমণ নির্দেশিকাও নয়। তাঁর এই জাতীয় রচনার মূল কথা 'মানুষ'। কালকূটের একটা ভ্রমণ পিয়াসী মন আছে, সেই মন ও তার মধ্যেকার ভাবনার জগৎ লেখকের চেনাপরিচিত দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক থেকে একেবারেই আলাদা। স্বাভাবিক ভাবে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে অন্যরকমভাবে। যার সূত্র ধরে ভাষা ও সংলাপও পাল্টে যায়।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-এর মধ্যে একটা সন্ধান লেখক করেছেন, যা তাঁর পরবর্তী রচনা 'কোথায় পাব তারে' এ বা অন্য রচনাগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। যেন কিছু একটা খুঁজে চলেছেন। মানুষের মধ্যে এমনকি প্রকৃতির মধ্যেও বিশ্বাতীত এক আনন্দকে তিনি পেতে চেয়েছেন। কালকূটের লেখার মধ্য দিয়ে এমন সব চরিত্র উঠে এসেছে যারা জীবনের কোন না কোন সময় সেই অতীন্দ্রিয় কিছুকে অনুভব করেছে এবং তার পরেও সারাজীবন সেই অনুভূতিকে স্পর্শ করার জন্য ফিরছে। এই আনন্দময় মূর্তিকেই লেখক অন্বেষণ করে ফিরেছেন। যেন তিনিও এদের মধ্য দিয়ে সেই সত্তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তাই ফিরেছেন তীর্থে তীর্থে, বাউল ফকির এবং প্রকৃতির মাঝে। গাজী মামুদ যেমন প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে, তাই কোনরকমের জাগতিক দুঃখ তাকে কোনরকম কষ্ট দেয় না। সে যেখানে যেখানে ফেরে সেখানেই সেই আনন্দকে খুঁজে ফেরে। কালকূট ও তেমনি আনন্দ খুঁজে ফেরেন।

কালকূট তাঁর আপন প্রাণের টানেই বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন স্থানে। তাঁর এই একক ভ্রমণে অন্তর্নিহিত রয়েছে সূক্ষ্মতা। সেই সূক্ষ্মতার বোধ তার প্রত্যেকটি যাত্রাপথকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। দ্রষ্টা ভ্রমণ পথের সমস্ত দর্শনীয় বস্তুকে গভীর অনুভূতির মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেন। তাই কালকূট সাহিত্যে স্থানিক মহিমা উত্তীর্ণ হয়ে যায় মানব মহিমায়। আর এই মানুষকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন হয় সূক্ষ্মতার জ্ঞান। যে সূক্ষ্মতার বিশ্লেষণে আধ্যাত্মবাদকে পাওয়া যায়। ক্রমশ যার গভীরে চলে আত্মার অনুসন্ধান। এমন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান বা এরকম রচনার সূত্রপাত আমরা দেখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে। সেখানে আমরা দেখতে পাই লেখকের আধ্যাত্মিক মনের প্রকাশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বর অন্বেষণ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আঠারো থেকে একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন-ঘটনাকে অবলম্বন করে 'আত্মজীবনী' লেখেন। এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তাকে, জগতের নিত্য সৌন্দর্যের

উপলব্ধিকে নতুন এক মাত্রায় প্রকাশ করেছিলেন, যা বাঙলা-সাহিত্যে একেবারে অভিনব বিষয়রূপে সংযোজিত হয়। প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যেও এমন সৌন্দর্য আছে যা রসিক হৃদয়ে মহান ভাবের সৃষ্টি করে—এই কথা আমরা দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত থেকে জানতে পারি। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'কে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক ধরণের আত্মচরিত বলা যায়। একান্ত বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভক্তি এবং গভীর অধ্যাত্মবোধ তাঁর রচনাকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তাঁর ভাব গভীর হওয়াতে ভাষাও হয়ে উঠেছে সহজ এবং পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ—

> ''পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, মৃগয়াশীল রাজকুমার রত্ন-কুণ্ডল, হীরার কণ্ঠী, মুক্তার মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্যের আভাতে তাঁহার সেই নবীন মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকে আমার বোধ হইল, যেন একটি বনদেবতা। এই তাহাকে দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ডুবিয়া গেল; এই সে কাছে, এই সে দূরে; এই নীচে, এই পর্ব্বতের উপরে। তাহার পরে আমি অতি কষ্টে একটা ভাঙ্গা সঙ্কীর্ণ পথ আরোহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিমলাতে উপস্থিত হইলাম।''[৪]

দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টির ব্যাখ্যাস্বরূপ দেখতে পাই—

> ''তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহনক্ষত্রগণকে চালাইতেছেন, তেমনি তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার ধর্মবুদ্ধি সকল প্রেরণ করিয়া আমার আত্মাকে চালাইতেছেন।''[৫]

দেবেন্দ্রনাথের রচনায় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা বেশি ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ ও অধ্যাত্ম অনুভূতি। লেখাগুলির মধ্যে লেখকের মনের একটি বিশেষ ভাবমুগ্ধতা বা তাঁর অন্তর-বিচ্ছুরিত এক জ্যোর্তিময় অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র গুরুত্ব বিষয়ে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ''তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (১৮৮৯) যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের মন্ময় অন্তরঙ্গতার একটি নূতন সুরে বাজিয়া

> উঠিয়াছে। তাঁহার এই সুরটি পরবর্তী যুগে তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথে আরও প্রসারিত ও বিচিত্র গ্রামে ধ্বনিত হইয়া প্রবন্ধের নূতন রূপবিধান করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ততটা ছিল না; তৎপরিবর্তে ছিল ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তা।"[৬]

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' পুরোপুরি ভ্রমণ কাহিনি নয়, এ তাঁর বাইরের জীবনের কথাও নয়। তাঁর আত্ম জীবনী প্রকৃত পক্ষে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনের ইতিহাস। কীভাবে দেবেন্দ্রনাথ এই অধ্যাত্মবোধে উত্তীর্ণ হলেন, সেই অধ্যাত্ম আনন্দের উপলব্ধিকে হারিয়ে ফেলে কীভাবে আবার তার সন্ধানে নানা জায়গায় বিশেষ করে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন—কীভাবে ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মিক স্তরে উত্তরণ ঘটলো—এখানে তার কথাই বর্ণিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের লেখায় আমরা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভবের কথা পাই। এই প্রকৃতি সজীব প্রাণময় এবং ঈশ্বরের কোমল স্পর্শে স্পন্দিত। দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের জীবনোপলব্ধি থেকে এই বোধ লাভ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে তিনি প্রাচ্য কবি হাফিজের বড় ভক্ত ছিলেন। নিজের উপলব্ধি প্রায়ই হাফিজের কবিতা উদ্ধৃত করে ব্যক্ত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় ভ্রমণ এক গভীর অধ্যাত্মচেতন মানুষের ঈশ্বরানুভূতির সন্ধানে যাত্রা। যে উপলব্ধি প্রথম যৌবনে তিনি লাভ করেছিলেন। 'আত্মার মূলতত্ত্ব' সন্ধানই তাঁর লক্ষ্য। হাফিজের কথা উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন— ''প্রকাশ হল না যে কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম; দুঃখ ও পরিতাপ যে আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া রয়েছি।"[৭] এরই জন্য তিনি বাড়ি ছেড়েছেন। ''আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ ঘোরে পড়িয়াছি।"[৮] ''আমি এখান হইতে পলাইব সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব আর ফিরিব না।"[৯] দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর মধ্যে ভ্রমণ একটি অংশ তা সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনি নয়। দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দ পুনরুদ্ধারের জন্যই তাঁর যাত্রা। বিহারীলাল সারদামঙ্গল কাব্যে সারদাকে একবার পেয়েছিলেন, তারপর তাঁকে হারিয়ে ফেলেন, আবার তার সন্ধানে হিমালয় ভ্রমণ করেন। বিহারীলালের অনুভূতিতে কাব্য মিস্টিক চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথেরও ভ্রমণও অনুরূপ অধ্যাত্ম উপলব্ধির সন্ধান। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করেন—তাই প্রকৃতি তাঁর কাছে সুন্দর। কাব্যে বিহারীলালের যে রোমান্টিক মিস্টিক চেতনা, 'আত্মজীবনী'তেও দেবেন্দ্রনাথের সেই চেতনা।

কালকূটের প্রকৃতিবোধ যথেষ্ট গভীর প্রকৃতির মধ্যে তিনি অধরা রহস্যের অনুভূতিকে (সম্ভবত) খোঁজেন। তবে তার চেয়ে বেশি খোঁজেন লোকালয়ে মানবজীবনের অতল গভীর রহস্য। আর খোঁজেন নিজের ভিতরকার পড়শী সত্তাটিকে। 'কোথায় পাব তারে' উপন্যাসে হাসনাবাদ থেকে লঞ্চে যাবার সময় নিজের পড়শী সত্তার কথা বোঝাতে বলেছেন—

> ''সমাজে সংসারে সেখানে যে ন'জনের ভাগাভাগিতেই বাস। সেখানে সকলেরই অন্নে জলে ভাগাভাগি লাগালাগি মুখোমুখি। কিন্তু যখন নিরালায় মন টানে তখন!... অনেক পড়শী আছে আছে তো, সময় বুঝে একবার নিজের ভিতরে যে পড়শী বসতো, তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ইচ্ছা।"[১০]

এই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা—এরই জন্য চাই নির্জনতা। দেবেন্দ্রনাথ সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—কালকূট সংসারে থেকেই মাঝে মাঝে নিজের সত্তাটির সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে পড়েন। দেবেন্দ্রনাথের যে কারণে সংসার ত্যাগ—সে এক সন্ধান হাফিজের কথা সূত্রে তার প্রকাশ ''কোথায় ছিলাম কেন এখানে আইলাম আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না।"[১১] কালকূটের অনুরূপ জিজ্ঞাসার কথা 'কোথায় পাব তারে' থেকে উদ্ধৃত করি ''কোথা থেকে এলাম, কে আমি! কোথায় যাই, কিসের সন্ধানে।"[১২] আবার ''মন গুণে কি ধন দেখো, সংসারেতে যত উৎসব, সব খানে যেন আমার 'খুজে ফেরা' ফেরে।"[১৩] আবার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অন্তর সত্তায় হারানো

> ''হঠাৎ হারাই, হারিয়ে যাই কোথায় যেন। আপন বলে চিনি যাকে, অস্তিত্ব যার নাম, যে আছে আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘিরে, সে যেন নিমেষে যায় কোথায়, তার সঙ্গে চলে যায় স্থান কাল পাত্র। কোথা থেকে কোথায় কেন এসেছি, সে কথা মনে পড়ে না আর। ... যেন কী এক সুর বাজে কোথায়, অদেখা অচিন লোকে মানুষের অধরা সীমায়। বাজে এক নামহীন সুর।"[১৪]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা ও অনুভব কখনো সেইরকম ভাষাতে কখনো কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ভাবে এ সব লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। তবে কালকূট মহর্ষির মতো সংসার উদাসীন নন। তাঁর খুঁজে ফেরা, মানব জীবনের সীমার মধ্যেই—মানুষের অধরা সীমায়। মানুষের মধ্যেই তিনি

সেই অসীম অধরা রহস্যকে খোঁজেন। মহর্ষির আশ্রয় ছিলো উপনিষদ আর হাফিজ। কালকূটের অবলম্বন কখনো বলরামের গান কখনো গাজীর বাউল গীত। গাজীর কথার ভিতর থেকে কালকূট নিজের কথা যেন খুঁজে পান ''কিন্তু গাজীটা কে! ও যেন ভিতর থেকে চেনে। ও কি আমার জন্মলগ্নের সাক্ষী! ও কি চিরদিন ধরে চেনে আমাকে!''[১৫] গাজীর গানের কথায়, আলাপের ভাষায় সেই পড়শীর সঙ্গে ইশারায় পরিচয় হয়। সে পরিচয়ও আধো-রহস্যে ঢাকা। ''যেন শতখানে 'সে' আমার থাকে অধরায়''[১৬] গাজী বলে ''কেমন বোঝেন বাবু?''[১৭] গাজীর গান আর হাফিজের কবিতা এখানে একই কাজ করে। প্রকৃত অর্থেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাওয়া যায়। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও প্রগাঢ় অধ্যাত্ম অনুভূতি আরো উচ্চতর সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। তাঁর রচিত ভ্রমণ কাহিনিগুলি যেমন—জাপান যাত্রী, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতি স্থানে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ও অন্যদিকে অসীম রহস্যের অপরূপ অনুভূতি ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধের সূক্ষ্ম পরিচয় ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাই—

> ''রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-পুষ্ট মন নিজের ক্ষেত্রেও সেই ঔপনিষদিক তত্ত্বপ্রতীতিকে প্রয়োগ করিয়াছে ও উহাকে কবিচিত্তের গভীর রসবোধ ও অসীমের সহজ অনুভূতির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঋষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতন্ময়তাকে এক সঙ্গে মিলাইয়াছে। অধ্যাত্মসত্য কবির ব্যক্তি চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ রসপরিণতি ও অর্থনিগূঢ়তা লাভ করিয়াছে; কবি যেন এখানে উপনিষদের এক নূতন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।''[১৮]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরেরই মহিমা দেখতেন। শেষ জীবনে তাঁর এই ভক্তি ও বিশ্বাস প্রেমে পরিণত হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী' -র অপু ও 'ইছামতী'-র ভবানী বাঁড়ুয্যে-র ঈশ্বর বিশ্বাস ও মুগ্ধ প্রকৃতি দৃষ্টি তো স্বয়ং বিভূতিভূষণেরই। যেমন—

> ''ভবানী বাঁড়ুজ্যে, মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তাঁর অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলি-পূর্ণ

অপরাহ্নে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে স্থলে ঊর্ধ্বে অর্ধে, দক্ষিণে উত্তরে, পশ্চিমে পূর্বে। যেখানে তিনি সেখানেই এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বসন্ত বৌরী পাখির হলুদ রঙের ঝলক ফুটে ওঠে।"[১৯]

এছাড়াও বিভূতিভূষণের কিছু আত্মচিন্তামূলক রচনা রয়েছে, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'স্মৃতির রেখা'। যেমন—

"... হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্ত্তিত, অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ।...

'সবশুদ্ধ মিলিয়ে এক এক সময় জীবনের কেমন গভীর আনন্দ এক এক মুহূর্ত্তে আসে। মানুষ এই আনন্দ জানতে না পেরেই অসুখে, হিংসায় স্বার্থদ্বন্দ্বে সুখ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আরও অসুখী করে তোলে।'[২০]

বিভূতিভূষণের চিন্তাভাবনায় যে একটা আধ্যাত্মিকতার ভাব আছে তা তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের ভিতর পাওয়া যায়। কখনো তার প্রকাশ ঘটে কাহিনির পাত্র-পাত্রীর জবানীতে, কখনও দিনলিপির মধ্যে তাঁর নিজের জবানীতে। বিভূতিভূষণের এই অধ্যাত্মভাবনা তাঁর লেখায় সর্বত্র পাওয়া যায়। যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরা হলো—

"একটা কথা আজকাল নির্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা Spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলো-ছায়া, আকাশ বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে।"[২১]

আরেকটি দৃষ্টান্ত 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি থেকে দিচ্ছি—

"আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া,

বন, নদী-বিল বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।"[২২]

আবার কোথাও বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

''শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনি বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতিতে যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।"[২৩]

এছাড়াও বিভূতিভূষণের অনেক উপন্যাসের নায়কই হলেন তাঁর প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রতিকৃতি। 'অপরাজিত' থেকে যেমন—

''এই জগতের পিছনে আর একটা জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবনযাত্রা তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূর দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথাও যেন ঢাকা আছে, কোন জীবন-পারের, মনের পারের দেশে।"[২৪]

বিভূতিভূষণ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী, বিদেহী আত্মায় বিশ্বাসী, এই সমস্ত বিশ্বাস তাঁর গল্প ও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বিভূতিভূষণে আমরা প্রকৃতির গভীর অনুধ্যান পাই কিন্তু কালকূটের মধ্যে প্রকৃতিকে তো পাই কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে তিনি মানব মনের অতলে ডুব দিয়েছেন। তবে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের অরণ্যপট আমাদের অভিভূত করলেও লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল পটবিধৃত মানুষ। যে মানুষ সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মানুষ নয়। কালকূটের লেখায় যেখানে আধুনিক মানুষ উঠে আসে, অন্য দিকে 'আরণ্যক'-এ প্রকৃতি ও মানুষ যেন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য রূপে দেখা দেয়।

কালকূট নিজে বিচিত্রতার পটে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বহু মানুষের মধ্যে আপন রূপকে খুঁজে ফিরেছেন। কোথায় যেন বিভূতিভূষণের গভীর সত্য উপলব্ধির আকুলতা তাঁর মধ্যে আমরা পাই। বিভূতিভূষণ বলেছিলেন—

''... আত্মাকে প্রসারিত করে দাও... চুপ করে চোখ বুজে বসে এই

> গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাযাত্রার উৎসবের কথা ভাবো—কোথায় যাবে তোমার দুদিনের বন্ধ জীবনের দৈন্য প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেড়িয়ে পড়ে দ্যাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, কি ঋদ্ধিশীল। কি অক্ষয় অনির্ব্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয়-সঙ্গত।"[২৫]

অজানার আনন্দই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। তাই কালকূটের অশান্ত প্রাণপাখী সব দিকের বন্ধনকে ফেলে রেখে অনন্ত আকাশে মুক্ত হয়ে উড়তে চায়। নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র সৌন্দর্যকে গ্রহণ করতে চায়। তবে গভীর চিন্তা একমাত্র শান্ত মনে গভীর সত্যের উদয়কে অবারিত করে, কিন্তু চিন্তা অনবরত বাধাপ্রাপ্ত হলে তার নাগাল পাওয়া যায় না। যা হয়তো এক বছরের নির্জ্জনবাসেই আসতে পারতো। বিভূতিভূষণ মনে করেন—

> 'By keeping it constantly before one's mind... By always thinking and thinking upon it, much is done under these conditions ... much might be sacrificed to oftain these conditions."[২৬]

কালকূট তাঁর অরণ্যত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম রচিত 'মন চল বনে' উপন্যাসে ঘাটশীলা স্টেশনে পৌঁছে বিভূতিভূষণকে তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। যথা—

> ''মাথা নত হয়ে আসে। মনে মনে বলি, যাই তোমারই ধ্যানাসনের সন্ধানে। তীব্র বিষের নিজের কি কোনো জ্বালাবোধ আছে? আমি কালকূট। হলাহল গভীর। আর কিছু না, তীর্থক্ষেত্রের ঝরাপাতার নিবিড় ছায়ায়, অমৃতের একটু বাতাস যদি ছুঁয়ে যায়!"[২৭]

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' (১২৮৭-৮৯ বঙ্গদর্শন) বাংলা সাহিত্যে বহু পরিচিত রচনা। 'পালামৌ'-এর সঙ্গে কালকূটের মিল পাওয়া দুষ্কর। নানা কারণে দুয়ের রচনা দুরকম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় সহজ স্বাভাবিক বিষয়ের ভিতর থেকে সৌন্দর্য নিষ্কাশনের ক্ষমতা ছিল। চন্দ্রনাথ বসুর মতে 'পালামৌ' উপন্যাস না হয়েও 'উপন্যাসের মতো' রচনা। কালকূটের রচনাগুলি 'উপন্যাসের মতো' তো বটেই—বরং উপন্যাস বেশি ভ্রমণ কাহিনি

কম। চন্দ্রনাথ বাবু সঞ্জীব চন্দ্রের রচনার মধ্যে সৃষ্টি ক্ষমতা দেখেছিলেন—কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানত বস্তুরসিক। তাঁর মধ্যে বস্তু দৃশ্য থেকে সৌন্দর্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, নির্জনতা প্রীতি ছিল, রোমান্টিক অনুভূতি ছিল। ''নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে... পৃথিবীর রঙ ফেরা দেখিতে যাইতাম। ... সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।''[২৮] এই রোমান্টিক মন, সৌন্দর্য প্রিয়তা এবং নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয় কালকূটের স্বভাবধর্ম। তাছাড়া কালকূটের রচনায় দেখি বহু রকমের মানুষের কথা—কিন্তু সে কথা সামাজিক মানুষের নয়, ব্যক্তি মানুষের। সঞ্জীবচন্দ্র সামাজিক মানুষের কথা বলেছেন—তাদের সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। তাদের সামাজিক জীবনের কথা বলেছেন। কালকূট সামাজিক মানুষের কথা বলেননি—কিন্তু মানুষের অন্তর্গহনের কথাচিত্র রচনায় তিনি স্বভাবতই সিদ্ধিপ্রাপ্ত। কালকূট ভ্রমণ কাহিনিকে ভ্রমণ কাহিনি রাখেননি—তাকে দৃশ্যমান থেকে মনোজগতের কাহিনিতে পরিণত করেছেন—ফলে তাঁর রচনা কেবল বস্তুদৃশ্য মাত্র নয়।

এছাড়াও জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যালের লেখাতেও এরকমই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত লেখকদের পরবর্তী সাহিত্যিক কালকূটের সমগ্র সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের প্রধান অন্বেষা প্রকৃতি ও মানুষ। এই 'মনের মানুষ'-এর খোঁজে তিনি তীর্থ ক্ষেত্রে, পাহাড়ে, অরণ্যে বিচরণ করেছেন। অজানার আনন্দই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। যেখানে তাঁর আত্মানুসন্ধানী মন মানুষের মধ্যেই খুঁজে বেড়িয়েছে ঈশ্বরকে। মূলতঃ বলা চলে কালকূট রচনা সমগ্রতে যদি ভ্রমণরস কিছু থাকেও তার আসল রূপ হল জীবন সত্যের অন্বেষণ। কালকূটের এই সাহিত্য ভিন্নধর্মী রচনা। এই রচনাগুলিতে ভ্রমণের যে রস পাওয়া যায় তাকে ছাপিয়ে যায় উপন্যাসের শিল্পগুণ। তাঁর রচনায় কোনো ভ্রমণ নির্দেশিকার উপাদান বা ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চার বা বৃত্তান্তের বিবরণ পাওয়া যায় না।

কালকূটের কিছু আগে থেকে যাঁরা ভ্রমণকাহিনি বা ভ্রমণকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখে চলেছেন বা যাঁরা কালকূটের সমসাময়িক লেখক তাঁদের লেখার সঙ্গেও কালকূটের লেখাকে ঠিক মেলানো যায় না। বরং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের মিল দেখা যায়। সেরকম মিল প্রকৃতি প্রীতি বা দৃশ্যমান প্রকৃতির অন্তরালে কোনো অরূপ সম্বন্ধে সন্ধানে। তাঁর লেখা শুরু করবার কিছুকাল আগেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভ্রমণকাহিনি হয়েও

উপন্যাসের গুণযুক্ত। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু যে কথা বলেছিলেন তাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য—ভ্রমণ কাহিনি হয়েও উপন্যাস। 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থের দুটি বড় শিরোভূষণ হলো প্রমথ চৌধুরী ও সুভাষচন্দ্রের দুটি চিঠি। প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাশক্তির প্রশংসা করে প্রমথচৌধুরী লিখেছেন চর্মচক্ষে বা কল্পনাচক্ষে তিনি যা দেখেছেন তাকে সাকার করে প্রকাশ করতে পেরেছেন। কালকূটের রচনার সঙ্গে তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' রচনাটির তুলনা করলে কোথাও কোথাও কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি। তবু কালকূটের রচনার সঙ্গে একটু তুলনা করা যায়।

'মহাপ্রস্থানের পথে' রচনার উত্তর ভাষণ লেখা হয়েছিল বইটি প্রকাশের বেশ কিছু পরে। সেখানে লেখক তাঁর যাত্রার পিছনে একটা ভিতরকার তাড়নার কথা লিখেছেন—'' 'নিজের ভিতরকার তাড়না আমাকে বারবার ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।''[২৯]

এই তাড়নার মূলে আছে তাঁর নিজের ভিতরকার ''নিগূঢ় অসন্তোষ আর অতৃপ্তি' এই অসন্তোষ নিয়েই তাঁর সন্ধানীমন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। 'কিছু আমার চাই' কিন্তু কী সে জিনিস তা নিজেই বোঝেন না, 'তার সত্যস্বরূপ আমার জানা নেই।' নিজে বলেছেন 'যেটাকে বলে পরম পিপাসা প্রাণসত্তার অন্তহীন অতৃপ্তি'—তারই টানে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন—কেদার বদ্রী যাত্রার পথে 'চারশো মাইলের কিছু বেশী' পথ হেঁটেছেন।''[৩০]

উত্তরভাষণ বই প্রকাশের পরে লেখা। উপক্রমণিকা বই প্রকাশের সময় লেখা। ১৩৩৯ সালে ১৯ বৈশাখ তাঁর যাত্রা শুরু। সেই যাত্রার উপক্রমণিকা অংশে লিখেছেন—''মানুষ হিসেবে তিনি 'নার্ভাস, ভয় চকিত, আরামপ্রিয়'।''[৩১]

পথে বেরোনোর সঙ্কল্প করেও বারবার পিছিয়ে পড়তে চান প্রাণের ভয় বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে, মনে হয় ''এখনো সময় আছে ফিরে যাই''[৩২] কিন্তু কে যেন তাঁকে ভূতের মতো টানচে। এই টানের জন্য, অন্তরের তাড়নার জন্যই তাঁর বেরিয়ে পড়া। ''যেদিন আসে পথের ডাক যেদিন বাজে দূরের ব্যাকুল বাঁশি সেদিন আমাদের গা-ঝাড়া দিয়ে একা একাই ছুটে বেরুতে হয়। তখন আর অপেক্ষা নেই পিছনে চাওয়া নেই।''[৩৩]

কালকূটের আগে আরো অনেকে এই অন্তরের তাড়না অনুভব করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রবোধকুমার সান্যাল যে তাড়নার কথা বলেছেন সেই অন্তর পুরুষের যাত্রার তাড়নার কথা কালকূট একাধিক জায়গায় বলেছেন।

‘কোথায় পাব তারে’ উপন্যাসে সে ডাকের কথা পাই তাঁর শৈশব থেকে। আর যে কোনো বেরিয়ে পড়ার পিছনেই থাকে তাঁর এই ডাকে সাড়া দেবার কথা। ‘মন চল বনে’ উপন্যাসের প্রথম বাক্য ‘তার ডাক শুনেছি অনেকদিন’ কিন্তু লগ্ন আসেনি বলে বেরিয়ে পড়া হয়নি। ‘‘শুনেছি স্বর চিনতে পারিনি।’’[৩৪] কারণ সময় হয়নি। সময় যখন হলো তখন চকিত মন বিবাগী খুশির ঘরছাড়া ডানায় বেগ পায়। ‘‘চলো ডাক এসেছে, সেই নীল পাহাড় থেকে সবুজ বন থেকে ইস্পাত-রঙ নদী নির্ঝর থেকে।’’[৩৫] এই ডাকের কথা তাঁর প্রথম লেখা থেকেই পাই। ‘গাহে অচিন পাখি’ শীর্ষক রচনায় কালকূটের যাত্রা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কবিতার লাইনে বলতে চেয়েছেন যে, বাঁশির গান শুনে তাঁর মন আনচান করে। গৃহকার্য্য স্মৃতিতে থাকে না। সেই ব্যাকুলতাই কালকূটের সমস্ত যাত্রার মূল তাড়না। সেই তাড়নার টানেই বুড়ি গঙ্গার প্রবল স্রোতে তাঁর অনির্দেশ্য যাত্রা। কালকূটের লেখায় যে তাড়না সেই তাড়নার নাম তিনি কখনো কখনো দিয়েছেন অরূপ—তারই সন্ধান ‘কোথায় পাব তারে’ নামক উপন্যাসে। ‘বাণীধ্বনি বেণুবনে’ রচনায় তিনি লিখেছেন—

> ‘‘আমি কোন ফকিরের বাঁশি শুনি! কোথা থেকে সে বাজায় কোনোদিন দেখতে পেলাম না। ... আমার কোন ছেলেবেলা থেকে শ্রবণ চকিত করে দিয়ে সে বাজাতে শুরু করেছে... ঘরে থাকাই দায়।... এখন, যখন সংসারের নাগপাশে বাঁধাবাঁধি, তখনো শুনি, বাঁশি বেজে ওঠে কোথা থেকে। দেখি, নাগপাশের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে অবশ হয়ে সে পড়ে থাকে সংসারের চৌকাঠে। আমি যাই বাঁশির ডাকে ডাকে। সে যে রূপ দেখাবে বলে, কেবল আমার মুগ্ধ দৃষ্টি নয়ন সুখের সংবাদ নিয়ে আসে তা-ই না। অরূপের স্বাদে, রূপ সাগরের তৃষ্ণা মেটাবে, সুরে তার এসব ইশারা বাজে।’’[৩৬]

কালকূটের লেখায় অবশ্য ‘মহাপ্রস্থানের পথে’র যাত্রা নেই। তাঁর যাত্রা সমগ্র ভারতব্যাপী —আবার বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে মেলা থেকে মেলায়। কিন্তু সে যাত্রায় তিনি যতো বেশি মানুষ দেখেছেন প্রকৃতিকে ততোটা দেখেননি। সেরকম ভ্রমণ রসিক প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ। তাঁর ‘আরণ্যক’কে ও এক অর্থে ভ্রমণকেন্দ্রিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। আর সেখানে প্রকৃতি আর মানুষ একাকার। কালকূটের লেখায় মানুষই শেষ পর্যন্ত মূল কথা। এখানে তিনি

ভাবের দিক থেকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মানব ধারণার কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছিলেন— ''দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর প্রণাম বারবার মানুষের কাছে গিয়েই পৌঁচেছে। এতবড় মানবপ্রেমিক কবি যিনি বলেন আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারাই মানুষ অত্যন্ত অবজ্ঞাত।''[৩৭] মানুষের ভিতর আর এক মানুষকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ যে মানুষ কেবল জৈবসত্তা নয় যার ভিতরে আছে আর এক শিল্পীরস রসিক প্রকাশ উন্মুখ সত্তা। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা।''[৩৮] 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণে বিচিত্র নামে একটি সংযোজনী জুড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে কালকূট লিখেছেন—''মানুষের চেয়ে বিচিত্র তো আর কিছু কোনোদিন দেখিনি। সে বিচিত্রের মাঝেই আমার অপরূপের দর্শন ঘটেছে।''[৩৯] জৈবিক মানুষের ভিতরে যে মানুষের আরেক সত্তার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যাকে তিনি বড় মানুষ বলেন—সেই মানুষের কথা কালকূটের লেখায় পাই। হয়তো রবীন্দ্রনাথেরই শিক্ষায় তার কথা ওঠে। কালকূট লেখেন সব মানুষেরই মধ্যে আর একজনের বসবাস থাকে। একজন, যিনি কাজ করেন বাঁচার জন্যে গলদঘর্ম হন দিবানিশি। কর্তব্য পালনে প্রায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত। আর একজন হলেন ভাবুক। তবে মানুষের এই অনুভূতির তীব্রক্ষণে, সে চিরদিনই বড় একলা। 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থে প্রবোধকুমার সান্যাল এত স্পষ্ট করে মানুষের ভিতরকার মানুষের কথা বলেননি, কিন্তু সমস্ত লেখায় মানুষের বাইরের আর ভিতরের রূপ উন্মোচন করতে করতে চলেছেন। কালকূটের সব লেখারই যা প্রতিপাদ্য—তা তিনি স্বভাবত সৃষ্টি ক্ষমতা থেকে উপলব্ধি করে থাকবেন—প্রবোধকুমার সান্যালও হয়তো যা উপলব্ধি করেছেন। প্রবোধকুমারের লেখা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য—আগেই উদ্ধৃত করেছি। চর্মচক্ষে অথবা কল্পনা চক্ষে দেখা জিনিসকে কথায় সাকার করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের কথার ধরণে লিখেছেন—''মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরের প্রয়োজনে—বন্ধুত্বের প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রয়োজনে, স্বার্থের প্রয়োজনে।''[৪০] রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে কেবল সৃষ্টির প্রয়োজনকে আলাদা করে অন্য সবগুলিকে এক করে দেন। তবে 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থে আমরা এই সবগুলি দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের কথা দেখতে পাব। দ্বিতীয়ত কালকূটের লেখায় যে দ্বিরায়তনিক মানুষের কথা পাই—প্রবোধকুমার স্পষ্ট করে তা না বললেও দুরকম মানুষের কথা বলেন—একরকম মানুষ স্থানু, সীমাবদ্ধ, গৃহগত প্রাণ—আর একজন এর বিপরীত সে মানুষ বৃহত্তর জগতের, উদার জীবনের ডাক শোনে সে মানুষ সঙ্গীহীন নিতান্ত একাকী নিরাসক্ত

ও নির্লিপ্ত হয়ে সেই পথের ডাকে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। প্রবোধকুমার বা কালকূট দুজনেই এসব ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে রবীন্দ্রনাথের কথাকেই ব্যবহার করেছেন।

কালকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। আর সে গ্রন্থে বহু মানবের মহামিলন মেলায়—কুম্ভমেলায় তিনি যে কতো মানুষ দেখেছেন—তারই কথা উঠে এসেছে। এরকম মানুষের কথা আমরা বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ করেছি। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। একেবারে যাত্রার সময় হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে ওঠা থেকে মানুষের যে বিচিত্র রূপ উন্মোচন করতে করতে চলেছেন তাই তাঁর মানববোধের পরিচায়ক। ট্রেনের কামরায় দেখা যক্ষারোগী, অন্ধ্রের তিন ভাই ও বড় ভাই-এর স্ত্রী, বলরাম, বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে শ্যামা, প্রেমবতীয়া, লক্ষ্মীদাসী, ডাক্তার পাঁচু গোপাল, প্রহ্লাদ, তার কচি বউ ব্রজ আর বুড়ি দিদিমা, হিদের মা, নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেস্টুরেন্টের রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়, ভূতানন্দ আর ভৈরবী চণ্ডিকে, রামজীদাসী—সবারই বাইরের জীবনের ভিতরে আর একটা জীবন খুলে দেখিয়েছেন। এক কথায় দু কথায় মানুষের মর্মভেদ করবার শক্তি ছিল তাঁর। একটি দুটি বাক্যে চরিত্রের অন্তঃসার ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা ছিল। প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও এরকম বহু মানুষের মেলা। তাঁর সহযাত্রীরা কেউ গাঁজাখোর, কেউ ভবঘুরে, কেউ আবার আখড়া তৈরি করাবার স্বপ্ন দেখা নিঃস্ব ব্রহ্মচারী, কেউ বেশ্যা, কেউ দাসী কেউ পূর্ণ যৌবনা ভৈরবী। কালীকম্বলী আশ্রমে সদাব্রত না পেয়ে ব্রহ্মচারীর দারিদ্র্যের সত্যরূপটি বিসদৃশ হয়ে ফুটে ওঠে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবধূতের চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা প্রশংসা করেছেন। মানস প্রেরণার গভীরে অবধূতই সর্বাধিক সাফল্যের সঙ্গে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছেন। ব্রহ্মচারী তাঁর যাত্রার সহযোগী বন্ধু। কিন্তু তাঁর মানস প্রবণতা উদ্‌ঘাটন করতেও তিনি পিছপা নন। গাঁজার নেশার ঘোরে সে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে। গোপনে শিব শিলা স্থাপন করে গ্রামের মানুষকে ঠকিয়ে কীভাবে সে অর্থ উপার্জন করবে তা তারই জবানীতে বলেছেন। আবার নিজের সম্বন্ধেও অবধূতের মোহহীন বিশ্লেষণ দেখতে পাই। নিজের ভিতরে যে একটি ভয় চকিত আরামপ্রিয় মানুষ তাঁকে পিছু টানছে তার কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছেন। টাকার থলিটি খুঁজে না পেয়ে নিজের অবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে কোনো মায়াঞ্জন নেই। কুকুরের মাথায় হঠাৎ আচমকা লাঠি মারলে যেমন হয় তাঁর অবস্থা তেমনি হয়েছে। এক নিমেষে প্রাণের রস শুকিয়ে গেছে। আর এই উত্তেজনার মধ্যে এতদিনকার পথসঙ্গী

ব্রহ্মচারীকেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে। ''সে ছাড়া আর কেউ নয়। এই তার পেশা ... ভণ্ড সাধুর বেশে মানুষকে চিরদিন সে বঞ্চনা করেছে।''[৪১] টাকার থলিটি সাময়িকভাবে হারিয়ে (এই হারানো প্রকৃত না ঔপন্যাসিক কৌশল?) নিজের ও নিজের সহযাত্রীর চরিত্রের অন্তর্লোকে ঢুকে পড়ার দ্বারা চরিত্র রচনার শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। 'মহাপ্রস্থানের কথা' সমরেশ বসু—কালকূট পড়েছিলেন। রাণী চরিত্র প্রবোধকুমারের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। রাণীর কথা প্রমথ চৌধুরীর মনে দাগ কাটে, সুভাষচন্দ্র বসু তাকে ভুলতে পারেন না। ''রাধারাণীর জন্য আমার বাস্তবিক কষ্ট হইয়াছে এবং আপনার উপর রাগ হইয়াছে।''[৪২] সুভাষচন্দ্র বসু এই ভাষায় তাঁর আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন। রাণীর সঙ্গে লেখকের দেখা আকস্মিক এবং প্রত্যাবর্তনের পথ রাণীর সঙ্গে চলবার চকিত চিত্তালোকে দ্যুতিময়। রাণীর অনেকটা পরিচয়ই এ বইতে আছে কিন্তু সে পথের পরিচয়। কালকূটের শ্যামাকে রাণীর উত্তরসূরী বলে মনে হয়। শ্যামার সঙ্গে ও লেখকের পরিচয় আকস্মিক, এবং যে পথের পরিচয় গূঢ় শ্লেষপূর্ণ কথা বা ইঙ্গিতের আড়ালে ঢাকা। সুভাষচন্দ্র রাণীর শুরু ও শেষ অপরিচয়ে ঢেকে দেবার জন্য (আপনার হৃদয় হীনতার জন্য) লেখকের উপর রাগ করেছেন। আর কালকূটের শ্বশুর মুখুজ্জে মশাই শ্যামার জন্য দুঃখ করেছেন—''শ্যামা মেয়েটির জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।''[৪৩] মুখোপাধ্যায় মশাই বলে উঠেছেন—''তোমার প্রতি মেয়েটির যেরকম টান দেখছি, তাতে তুমি তাকে চুমো খেলেও কোনো অন্যায় হতো না।''[৪৪] শ্যামার সঙ্গে কথকের কথোপকথন, দেখা সাক্ষাতের বিবরণ তেমনভাবে দেওয়া নেই। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে কথকের দু একদিনের দেখা সাক্ষাতের যে ছবি পাই তাতে শ্যামার অন্তর লুকোনো থাকে না। শ্যামার সঙ্গে মেলার মধ্যে একদিনের সাক্ষাতের একটি ছবি এরকম ''আজ রাঙা শাড়ি পরে এসেছে, কিন্তু সারা মুখে ব্যথা নীল যমুনার স্থির ও গম্ভীর ছায়া। ভেজা চুল এলানো। বাঁকা চোখে তার অভিমান ক্ষুব্ধ তিরস্কার। তাকিয়ে প্রথমে শুধু বললো, 'মিথ্যুক'।''[৪৫] এই একটি 'মিথ্যুক' শব্দ শত শত বাক্যের চেয়েও বেশি ভাবব্যঞ্জক। রাণীর সঙ্গে পথেই শুধু কথকের কথা; কতো চোখে সন্দেহ তির্যক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারই মধ্যে নানা ছলনায় কথা বলবার একটু অবসর তৈরি করে নিতে হয়। রাণী বলে—''শাসন আর সন্দেহ মাথা চাপড়াতে থাকুক আমরা এগিয়ে যাই।''[৪৬] শ্যাম বলেছে—''এখানে রোজ চান করতে আসব যে কদিন আছি। আসবে তো? আসতে হবে।''[৪৭] স্বামী 'সতীন' সঙ্গী সাথীদের চোখের উপর শ্যামাকে থাকতে হয় কিন্তু শ্যামার ঝি প্রেমবতীয়া তাকে নিয়ে কথকের তাঁবুতে তার খোঁজে যায়। শ্যামার স্বামী বলে—''আমার ছোট বউ তোমার

কথা খুব বলে। তারপর হঠাৎ গুরু গম্ভীর গলায় বললো 'ভগবান তোমার ভালো করুণ'।"[৪৮] এতোটা সহনশীলতা রাণীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তার চারদিকে নিষেধ আর অবরোধ জ্ঞাতি ভাই-ভগ্নীপতিদের সঙ্গেও তার কথা বলা নিষেধ। তাই রাণীকে অনেক কৌশল করতে হয়। সে বলে শেষের কটা দিনের সাক্ষাত তার কাছে জপের মালার রুদ্রাক্ষের মতন গাঁথা হয়ে থাকবে।

শ্যামার সঙ্গে স্টেশনে শেষ কথা- এই শ্যামাকে, নতুন বিধবাকে মনে থাকবে তো? রাণী স্টেশনে নেমে আর কোনো কথা বলতে পারেনি। কিন্তু বালামৌ স্টেশনে যাতে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র নায়ক না নেমে যান সেজন্য সে সারারাত ট্রেনে জেগে কাটিয়েছে।

> ''বালামৌতে আপনার নামা হবে না।
>
> - কেন?
>
> নিদ্রিত দিদিমার দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে তিনি বললেন 'বাড়ি ফিরতে হবে আপনাকে।...
>
> তিনি যেন আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই আমার দিকে ফিরে উজ্জ্বল চক্ষে চেয়ে বললেন 'এই বা কী? কতটুকুই বা? এত ত মিথ্যে, এত ত অর্থহীন, আপনি কি কিছু বিশ্বাস করেন? ইহকাল? পরকাল? পুনর্জন্ম?"[৪৯]

শ্যামার স্পষ্ট মনে রাখার আকূতির পাশে রাণীর এই জন্ম ও জন্মান্তর অতিক্রান্ত স্মৃতি-বিস্মৃতির আকুলতা কী কম মহত্তর?

শ্যামা সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—''শ্যামা স্বৈরিণী নয়। এক কুলীন ভুঁইহার ঘরের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী বউ। হৃদয়ে তার বহু বজ্রের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ রয়েছে চাপা।"[৫০]

এই কথারই পুনরুক্তি হয় সংস্করণে যুক্ত 'বিচিত্র' অংশে—''শ্যামা স্বৈরিণী নয়! যদি কেউ তা ভাবেন, সে নৈতিক দায়িত্ব আমারই। তাকে বাইরে প্রকাশ করেছি আমি।"[৫১]

রাণীর প্রসঙ্গে লেখকের একটি বর্ণনা—

> ''রাণী যে দীক্ষা নিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যা জপে বসেন তা আমি জানতাম। ... কিন্তু তার চেহারা যে এমন তা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। সম্মুখে লণ্ঠনের আলো জ্বলচে, তারই কাছে আসনের উপরে

তিনি ধ্যানে বসেছেন, চক্ষু দুটি মুদ্রিত; মুখের উপরে শুধু যে তাঁর
একটি অপূর্ব লাবণ্য ও দীপ্তি ফুটে উঠেছে তাই নয়, সে মুখে একটি
প্রশান্ত পবিত্রতা; সংযম ও সহজকৃচ্ছ সাধনার একটি অনির্বচনীয়
মাধুর্য—এমন জ্যোতির্ময় রূপ সহসা চোখে পড়ে না।"[৫২]

আরো নানা খুঁটিনাটি দিক থেকে দেখলে 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'—দুই গ্রন্থের মধ্যে এবং দুই লেখকের ভাবনার মধ্যে কিছু মিল দেখা যাবে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লিখতে বসে প্রথমেই কালকূট লিখেছেন বৈচিত্র্যের সন্ধান আসলে আমাদের মনেরই এক প্রাণের সন্ধান। মানুষ খোঁজার ছলে আমরা খুঁজি মন। 'মহাপ্রস্থানের পথে'তে পাই ''বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মানুষের সহজাত। বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সে আন্তরিক আনন্দ পায়।"[৫৩] কালকূট বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের টিকিটধারী সদস্য ছিলেন। তাই কুম্ভমেলা যাওয়ার উদ্যোগেই কত প্রশ্ন ধেয়ে এসেছিল।

'' - কেন যাচ্ছ কুম্ভমেলায়? ধর্ম করতে নাকি? ...
- বললাম 'দেখতে'।
- কী দেখতে? লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ মানুষকে?
ধর্মান্ধ! লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজেই দেখি না কেন,
লক্ষ মনের কোন চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি!"[৫৪]

মনে পড়বে গোরা ঠিক এই কারণেই লক্ষ মানুষের সমাগমে গিয়েছিল। প্রবোধকুমার বদরী নারায়ণের মন্দিরে ঢুকে নিজেই প্রশ্ন করেছেন—'কত মৃত্যু-মহামারী, কত ক্লেশ ও উৎপীড়ন, কত পথের কত ঘটনা ও সংঘাত আজ কি তার কোনো মূল্য নেই?' নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন—

''কে বলেছে মূল্য নেই। কত যুগ যুগান্তর, কত কাল-কালান্তর
ব্যাপী লোক-প্রবাহ অবিশ্রান্ত বয়ে এসেছে এই বিরাটের তীরে, কোটি
কোটি পিপাসার্ত হৃদয় মুক্তি বাসনায় বিগলিত অশ্রুতে ভেঙে পড়েচে
এর চরণপ্রান্তে—আজ আমার মতো নগণ্য মানুষের শিথিল সন্দেহ
আর অবিশ্বাসবাদে তার মূল্য কি যাবে কমে?"[৫৫]

দুজনের মিল যেমন আছে পার্থক্যও তেমনি কম নেই। কালকূটের লেখায় মানুষের অন্তর

সত্তার উন্মোচনই প্রধান, সেখানে প্রবোধকুমার কিছুটা ক্রিটিক্যাল।

'পূর্ণকুম্ভ' বইটি রাণীচন্দের লেখা। ১৩৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাণীচন্দের লেখা সহজ এবং আন্তরিক। আর একটি সরস চিত্তের প্রসাদ গুণ সমস্ত লেখাটির ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দ প্রবাহে বয়ে গেছে। রাণীচন্দের পূর্ণকুম্ভ কালকূট পড়েছিলেন কিন্তু 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' 'পূর্ণকুম্ভ'র মতো হয়নি। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে শুরু 'পূর্ণকুম্ভ'র মতো ট্রেন যাত্রা দিয়ে কিন্তু ট্রেন যাত্রার উভয়ের অভিজ্ঞতা একেবারে বিপরীত। 'পূর্ণকুম্ভ'-এর ট্রেন যাত্রার বর্ণনার মধ্যে লেখিকার সরস প্রসন্ন চিত্তের দীপ্তি কথার পিঠে পিঠে স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথের কথকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো তাঁর। ঘরোয়া কথায় রবীন্দ্রনাথের কৌতুক দীপ্তির ছটা ছড়িয়ে পড়তো। রাণীচন্দের লেখায় সেই গুণ দেখতে পাই। কিন্তু কালকূটের লেখায় যেভাবে ঘটনা পরম্পরায় অন্য চরিত্রের উন্মোচন আছে, সেটা নেই। কাজেই দুই রচনার তুলনা চলে না। রাণীচন্দের লেখায় তীর্থক্ষেত্রের পৌরাণিক মাহাত্ম্য কথন আছে। সেটা কালকূটের লেখায়ও আছে। সন্ন্যাসী সমাজের কথায় রাণীচন্দের একটু বেশি ঝোঁক। 'বড়দি' চরিত্রটি সন্ন্যাসী দর্শন করতে চান তাঁদের কথা শুনতে চান। কালকূট কুম্ভমেলায় শেষ রাত্রে পাপী মানুষের মৃত্যুকামনা শুনেছেন আবার অবধূতের গঙ্গা স্নানের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি শুনিয়েছেন অক্ষয় বটের কথা শত শত মানুষ যেখান থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সন্ন্যাসীর (কোতোয়াল) মুখে যেভাবে রামজীদাসী-রঘুনন্দনের প্রেম কাহিনি ব্যক্ত করেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। এসব কতোটা তাঁর দৃষ্ট কতোটা সৃষ্ট সেটা আমাদের মনে আমাদের ভাবায়। ভ্রমণ কাহিনির অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। তাতে উপন্যাসের মতো বৃত্ত রচনা হয় না। চলমান অভিজ্ঞতার শিলারূপই ভ্রমণ কাহিনি। কালকূটের অনেক লেখায় একটি নারী আকর্ষণ বিন্দু হিসাবে চলে আসে। যার প্রণয়ের পাত্র হিসেবে কথক চরিত্রকে তুলে ধরা হয়। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র কাহিনিতে প্রবোধকুমার এরকম চরিত্র এঁকেছেন। কিন্তু অবধূত নিজেকে উপলক্ষ করে কোনো প্রেম কাহিনি বলতে বসেননি। তাঁর ভ্রমণ কাহিনি মরু পথের রৌদ্র তাপ-সন্তপ্ত পুণ্য লোভাতুর মানুষের কষ্টকর যাত্রার কাহিনি। প্রবোধকুমার বা অবধূত পথের সে সন্তাপ সহ্য করেছেন কালকূটকে তা করতে হয়নি। তাঁর গমনাগমন ট্রেন পথে বা অন্য কোন বাহনে—পদব্রজে নয়। 'তুষার সিংহের পদতলে' কিংবা 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' তাঁর দেখা মানুষের গল্প। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজের' সঙ্গে কালকূটের মিল প্রধানত মানুষের অন্তর লোকের

উন্মোচনে। কালকূট এ কাজে সিদ্ধ। প্রকৃতি বর্ণনা অপেক্ষা দৃষ্ট মানুষের সমস্যাই তাঁর চোখে পড়ে। অবধূত চলেছেন মরুপথ পার হয়ে হিংলাজ-এ। যাত্রাপথের সঙ্গীদের সঙ্গে তার ক্রম পরিচয়ের সূত্রে উদ্ঘাটিত হতে থাকে তাদের চরিত্র পরিচয়। কাহিনির অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে গ্রন্থের প্রায় শুরুতে এনেছেন থিরুমল-কুন্তীর প্রেমের গল্প। মরুভূমির মধ্যে কুন্তীর উপর লালসার নখদন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে থেঁতলে দিয়েছে। সেই কুন্তী আর থিরুমলকে উদ্ধার করবার পর তারা হয়ে গেল এই যাত্রীদলের সঙ্গী। ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে এসে জুড়ল এক প্রেমিক প্রেমিকার ব্যক্তি জীবনের গল্প। চলার পথ দীর্ঘ, পথের বিপদ একটা প্রকৃতিগত—মরুভূমির উত্তাপ, জলের কষ্ট, খাবার সমস্যা, বিশ্রামের স্থানাভাব, পথ ভুল হবার ভয়, অসুস্থ হয়ে পড়া, আর পথের দস্যু দলের উৎপাত। এর মধ্যে তৃতীয় উৎপাত হল কুন্তী আর থিরুমলের সম্পর্কের সমস্যা। থিরুমলের আর কুন্তীর জীবন কথা একটু করে জানা যায়। পথের কষ্টে মানুষের কাতরতা এমনকি মৃত্যুও ঘটেছে। তার মধ্যে থিরুমল তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে প্রায় উন্মাদকর অবস্থায় পৌঁচেছে। অবধূতের আর একটি কৌশল দেখি চন্দ্রকূপে গিয়ে সবাইকে সত্য কথা বলতে হবে জীবনে পাপ অন্যায় যে যা করেছে তা স্বীকার করতে হবে। পোপটলাল চলেছেন চন্দ্রকূপে আত্ম অপরাধ স্বীকার করে পাপ স্খালন করতে। অল্প বয়সে বিধবা বৌদির সঙ্গে যে অবৈধ সম্পর্কে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন তার কলুষ তাঁর মনে সর্বক্ষণ জেগে থাকে। তার থেকে মুক্তি চাই। সুন্দর লালও এরকম এক অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কিন্তু সে কথা তিনি চন্দ্রকূপে স্বীকার করতে চাননি। তাই বাবা চন্দ্রকূপ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর থিরুমল ভুলিয়ে এনেছিল স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে কুন্তীকে। মরুভূমিতে তার উপর লিপ্সা ক্লেদ বসিয়ে দিয়েছিল যারা, সেই পলাতক তিন ধর্ষকের রক্তে দিল মহম্মদের টাঙ্গি লাল হয়েছে। তবু কুন্তীর অপরাধবোধ যায়নি, প্রায়োন্মাদ থিরুমল স্বাভাবিক হয়নি। এই সব নিতান্ত মানবিক সম্পর্ক দোষ গুণের গল্পই অবধূতের বিষয়। যে তীর্থ যাত্রীরা চন্দ্রকূপে দোষ স্খালন করে পুণ্যার্থী হয়ে হিংলাজের পথ হাঁটে তাদের মধ্যেই কেউ (লম্বুষ গোকুল) রাতের অন্ধকারে কুন্তীর উপর লালসা চরিতার্থ করতে যায়। এমনিভাবে পোপটলাল তার পাপ স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। সুন্দরলাল সব কথা না বলায় চন্দ্রকূপের বুদ্বুদ ওঠা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—হাওয়া বইছে না। সব কিছু দোষ স্বীকার করবার পর আবার তা স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু এই অলৌকিকতাকে লেখক বেশি মূল্য দেননি। কুন্তীর সঙ্গে সম্পর্কের

ভাঙচুরের ফলে প্রায় উন্মাদ থিরুমল এই চন্দ্রকূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আর সেই আঘাতে প্রচণ্ড শক পেয়ে চন্দ্রকূপ থেকে সকলেই পালাচ্ছে। ভুল তাদের ভেঙেছে। এতদিনকার সংস্কারের চির প্রচলিত প্রথার উল্লেখ যেমন করেছেন তেমনি তাকে বেশি আমল না দিয়ে মানবতার গুরুত্বই দেখাতে চেয়েছেন। চন্দ্রকূপে থিরুমলের আত্ম বিসর্জনের পর নিজের উপলব্ধি বোঝাতে গিয়ে অবধূত লিখেছেন—

> ''ক্ষমা কৃপা অনুকম্পা সমবেদনা এসবের জন্যে ওর কাছে মাথা খোঁড়বার লেশমাত্র প্রবৃত্তি নেই আমাদের। দোষ ত্রুটি পাপ অপরাধ যা কিছুই করে থাকি এ জীবনে; করেছি মানুষের কাছেই। সে সবের মার্জনা পাবার জন্যে মানুষের পায়েই মাথা খুঁড়তে হবে। দেবতার কাছেও না দানবের কাছেও নাই। ওরা দুজনেই একই বস্তুর এ পিঠ আর ও পিঠ।''[৫৬]

এই মানববোধ কালকূট, প্রবোধকুমার, অবধূত এঁদের সকলেরই ধর্ম। অবধূতে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা একটু উল্লেখ করি।

> '' 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাস লক্ষণান্বিত চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী। ... দরদী মননক্রিয়া ও জীবন সমীক্ষা গ্রন্থখানির উপভোগ্যতা। বাড়াইয়াছে। তীর্থযাত্রীদের মনের খবর, গোপন অপরাধবোধ ও প্রত্যেকের বিশেষ জীবন সমস্যা এই ভ্রমণ বিবরণকে অন্তর রহস্যের তীক্ষ্ণ আভাসে, অন্তর্দাহের তীব্র উত্তাপে মানবিক পরিচয়ে তাৎপর্য পূর্ণ করিয়াছে।''[৫৭]

জলধর সেনের 'হিমালয় ভ্রমণ' কথা বেরিয়েছিল ১৩০০-১৩০১ বাংলা সনে, ভারতী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায়। পরে ১৩০৭ সালে (১৯০০ খ্রিঃ) তা বই হয়ে বেরোয়। জলধর সেন হিমালয়ে গিয়েছিলেন বহু স্বজন মৃত্যুর শোক সন্তপ্ত চিত্তকে সুস্থ করতে। দীর্ঘকাল দেরাদুরে থেকে এবং হিমালয়ে ভ্রমণ করে হয়তো তাঁর চিত্তের বেদনা কিছুটা নিরসন হয়েছিল। তিনি ছিলেন স্বভাব সৌন্দর্যের পক্ষপাতী এবং প্রকৃতির চিত্র রচনায় অনুরাগী। প্রবাস চিত্র, হিমালয় এসব লেখায় তাঁর ঈশ্বরভক্ত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুরাগী চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে। জলধর সেন দু-একটি ছোট ছোট বর্ণনায় মানবিক চিত্র রচনায় পারদর্শী ছিলেন। দেবপ্রয়াগে পার্বত্য রমণীদের

সহানুভূতির উদ্রেক করবার বর্ণনায় তার পরিচয় পাই। এই দূরদেশে সেই সব রমণীর ব্যবহারে তিনি মা ও বোনের স্নেহের আভাস পেয়েছেন। সব চেয়ে যে ঘটনাটি অন্তরস্পর্শ করে তা হল দুটি ছোট মেয়ের আন্তরিকতা। অলকানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের কাছে নির্জনে লেখক একটি শিলা খণ্ডের উপর বসেছিলেন। এই রকম সময় দুটি ছোট ছোট পাহাড়ী মেয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তার বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে আছে কয় ভাই বোন—এই রকম কথায় আলাপ জুড়ে দেয়। লেখক তাদের বললেন ''আমার বাপ নেই স্ত্রী নেই ছেলেও নেই'' তখন করুণ আয়ত চোখ মেলে ছোট মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞেস করে '' লেড়কি ভি নেহি ?'' লেখক বলছেন ''কথাটা আমার প্রাণে তিরের মতো বিদ্ধ হল।''[৫৮]

জলধর সেনের লেখা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছিলেন—''ভ্রমণ কাহিনীর ভিতর যে কতখানি মৌলিকতা, সরস লেখার কায়দা, তাজা, আনন্দ ও আন্তরিকতা এবং উপন্যাসের উত্তেজনা থাকতে পারে জলধরবাবুর রচনাগুলিই বাঙালীকে সর্বপ্রথম তা দেখিয়ে দিলে।''[৫৯] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর পালামৌ থেকে শুরু করে কালকূট পর্যন্ত ভ্রমণসাহিত্যের ধারাবাহিক পর্যালোচনা এখানে করা হয়নি। কিন্তু কিছু অতি পরিচিত ভ্রমণ কাহিনির আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে এদের প্রধান ধর্ম এরা প্রায় প্রত্যেকেই উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। পালামৌকে কে চন্দ্রনাথ বসু উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত বলেছিলেন, হিমালয়কে হেমেন্দ্রকুমার রায় 'উপন্যাসের উত্তেজনা' সংযুক্ত বলেছেন, অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'উপন্যাস লক্ষণান্বিত'। কালকূটের রচনাগুলিতে উপন্যাসের লক্ষণ যথেষ্ট। ভ্রমণ কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য প্রধানত একটি নিজের দেখা শোনার প্রকাশ আর একটি যথাসম্ভব নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে মানুষের জীবনের কথা বলা। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কালকূটের লেখায় উপন্যাসের ধর্মকে প্রবল করে তুলেছে। মানুষই তাঁর কৌতূহলের বিষয়, মানুষের আপাত স্বভাবের গভীরে আরও যে এক সুখ দুঃখভোগী মানুষ থাকে তাকেই প্রকাশ করবার দায়িত্ব ঔপন্যাসিকের। অবধূত, প্রবোধকুমার কালকূট এ কার্যে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সফল।

তথ্যসূত্র :

১. কালকূটের চোখে সমরেশ বসু—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র ৮ম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৫৩৮

২. অতিথি—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র ৭ম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—১৯৮২—পৃ. ৩২৩৮-৩২৩৯

৩. প্রসঙ্গ সমরেশ : একটি সাক্ষাৎকার---সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়---সমরেশ বসু সংখ্যা—অপরাজিত—জানুয়ারী, ১৯৮২—পৃ. ১৯

৪. আত্মজীবনী---দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর---সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত---বিশ্বভারতী—সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ, ১৮৯৮—পৃ. ২২৮

৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৫৯

৬. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা---২য় খণ্ড---'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'---শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি—১৯৫৯—পৃ. ১২৩

৭.আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত— বিশ্বভারতী—১৮৯৮—পৃ. ১৭২

৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৩

৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৪

১০. কোথায় পাব তারে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৫৮২

১১. আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত— বিশ্বভারতী—১৮৯৮—পৃ. ১৭২

১২. কোথায় পাব তারে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৬৬৫

১৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬১২

১৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৪৩

১৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৬৫

১৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬১২

১৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬১৩

১৮. 'রবীন্দ্রনাথ'—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—২য় খণ্ড—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি—১৯৫৯—পৃ. ১৪৮

১৯. ইছামতী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স—আশ্বিন, ১৩৮২—পৃ. ১৩৭

২০. 'স্মৃতির রেখা'—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতি রচনাবলী—১ম খণ্ড—মিত্র ও ঘোষ—২৮ শে ভাদ্র, ১৩৭৭—পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

২১. 'তৃণাঙ্কর'—বিভূতি রচনাবলী—৪র্থ খণ্ড—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:—জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩—পৃ. ২১৮

২২. পূর্বোক্ত—পৃ. ২২১।

২৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ২২০

২৪. অপরাজিত—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতি রচনাবলী—২য় খণ্ড—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:—আষাঢ়, ১৪০২—পৃ. ২৪২

২৫. 'স্মৃতির রেখা'—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতি রচনাবলী—১ম খণ্ড—মিত্র ও ঘোষ—২৮ শে ভাদ্র, ১৩৭৭—পৃ. ৩৭২

২৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৩৬৩।

২৭. 'মন চলো বনে'---কালকূট---কালকূট রচনাবলী---৪র্থ খণ্ড---ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৭৪১

২৮. পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদনা প্রহ্লাদ প্রামাণিক—ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি—১৯৭১—পৃ. ১০

২৯. মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স—ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪০৪—পৃ. ১

৩০. পূর্বোক্ত—পৃ. ২

৩১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮

৩২. পূর্বোক্ত

৩৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭

৩৪. মন চলো বনে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৭৩৭

৩৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৩৮

৩৬. বাণীধ্বনি বেণুবনে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—২য় খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৪৯২

৩৭. চিঠিপত্র-৯—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বভারতী—২৫ শে বৈশাখ—১৩৭১—পৃ. ৪

৩৮. সৃষ্টি—রবীন্দ্র রচনাবলী—খণ্ড ১৪—পশ্চিমবঙ্গ সরকার—জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ—১৯৬১—পৃ. ৩২৪

৩৯. গ্রন্থ পরিচয়—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র-৮—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৭০

৪০. মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—উপক্রমণিকা—মিত্র ও ঘোষ—১৩৯২—পৃ. ৭

৪১. মরুতীর্থ হিংলাজ—অবধূত—ভ্রমণ কাহিনি সমগ্র—অপ্রাপ্ত—পৃ. ২৯

৪২. ভূমিকা—মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—মিত্র ও ঘোষ—শ্রাবণ, ১৩৯২—ঊনবিংশ মুদ্রণ

৪৩. গাহে অচিন পাখি—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র-১—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৪৯

৪৪. পূর্বোক্ত

৪৫. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র-১—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৩৫

৪৬. মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—মিত্র ও ঘোষ—১৩৯২—পৃ. ১২০

৪৭. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র-১—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৩৫

৪৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৩৬

৪৯. মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—মিত্র ও ঘোষ—১৩৯২—পৃ. ১৪২

৫০. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র-১—নিতাই বসু

সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২২৯

৫১. গ্রন্থ পরিচয়—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র-৮—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৩৭২

৫২. মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—মিত্র ও ঘোষ—১৩৯২—পৃ. ১২৫

৫৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০৩

৫৪. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র-১---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৫৯

৫৫. মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল—মিত্র ও ঘোষ—১৩৯২—পৃ. ৯৭

৫৬. মরুতীর্থ হিংলাজ—অবধূত—ভ্রমণ কাহিনি সমগ্র—অপ্রাপ্ত—পৃ. ১৭১

৫৭. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চম সংস্করণ—১৯৬৫—পৃ. ৭৯৩

৫৮. হিমালয় সমগ্র—জলধর সেন—সম্পাদক ড. সুবিমল মিশ্র—দে বুক স্টোর—২০০৮—পৃ. ১২৯

৫৯. পূর্বোক্ত—ভূমিকা—পৃ. ১৭